নওয়াব আবদুল লতিফ: আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ

দৈনিক ইনকিলাব
দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 06 JUL 1986 পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

004-A

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে রাজ্যহারা, বিত্তহারা, শিক্ষা-দীক্ষায় অমানিশার অন্ধকারে দিশেহারা মুসলমান সমাজ। ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে আইনজীবী ফকির আহমদের ঘরে জন্মলাভ করে এক প্রদীপ্ত সূর্য। নাম আবদুল লতিফ। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার এ্যাংলো এরাবিক বিভাগ থেকে তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে ১৮৪৬ সালে প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। পরে কলকাতা মাদ্রাসায়। ১৮৪৯ সালে হন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তকা হিসেবেই ১৮৮৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। চাকরি জীবনে কর্মনিষ্ঠা ও ন্যায়-সত্যের প্রতিষ্ঠায় যে দুর্জয় সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, আদর্শস্থানীয়, সমাজসংস্কারমূলক কাজে তিনি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অবদান রেখেছেন বিশেষ করে মুসলমান সমাজের শিক্ষার ক্ষেত্রে।

কর্মজীবনে প্রবেশকালটা বাংলাদেশের, বাংগালী মুসলমানদের জাতীয় জীবনে এক দুর্যোগপূর্ণ সংকটকাল। লর্ড কর্নওয়ালিশ ভূমি রাজস্বের বিধি-ব্যবস্থার অজুহাতে পাঁচসালা, দশসালা, সর্বশেষ ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুটচক্রে সান্ধ্য আইনের কবলে ফেলে শক্তিশালী বিজিত ভূস্বামী জমিদার, আয়মাদার, তালুকদার, মজুমদার সবাইকে রাতারাতি বিষয় সম্পত্তিচ্যুত করে নিঃস্ব কাঙাল বানান। ১৮২৮ সালে খাজনা হ্রাসের ভুয়া অজুহাতে সুকৌশলে বৃটিশ সরকার মসজিদের সেবা সংরক্ষণ ও মসজিদ কেন্দ্রিক মকতব মাদ্রাসার জন্যে, প্রদত্ত ওয়াকফ-লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। মুসলিম শিক্ষার স্থায়ী আয় উৎস বন্ধ করা হল। ১৮৩৫ সালে শিক্ষার মাধ্যম করা হল ইংরেজী। আলেম সমাজ করলেন ওকেমাওলাত। ১৮৩৭—৩৯-এর মধ্যে অফিস আদালতে ব্যবহৃত ফারসীর পরিবর্তে প্রচলন করা হল ইংরেজী। মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চাকরির দরজা হয়ে গেল বন্ধ। কোম্পানী-শাসন সুপরিকল্পিত উপায়ে বিজিত জাতি মুসলমানকে দাবিয়ে রাখার গোপন নীতি আবলম্বন করল। শিক্ষায় হানল দারুণ আঘাত। ১৮৫৪ সালে শিক্ষা ডিসপাসের বিধানে মক্তব মাদ্রাসার সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হল।

বলাবাহুল্য, এ ব্যাপারটা চলছিল ইংরেজ ও হিন্দু এক রহস্যজনক আঁতাতের মাধ্যমে। এ সম্পর্কে তদানিন্তন বৃটিশ চিন্তাবিদরা বলেছেন, জাতি (মুসলমান) আমাদের প্রতি মূলতঃ শত্রুভাবাপন্ন আর আমাদের সত্যিকার নীতি হল হিন্দুদের সাথে সহযোগিতা করা (লর্ড এলেজবরা) পক্ষান্তরে হিন্দুরাও ইংরেজের প্রতি সম মনোভাবের পরিচয় দেয়। ১৮২৩ সালে বৃটিশরাজের নিকট প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে তারা লিখলেন "আপনাদের অনুগত প্রজাবৃন্দ কখনই ইংরেজ জাতিকে বিজেতা হিসেবে গ্রহণ করে নাই বরং করেছে প্রাণকর্তা হিসেবে। আর মহামান্য রাজাকে কেবলমাত্র শাসক হিসেবেই দেখেন না বরং পিতা ও আশ্রয়দাতা হিসেবেই মনে করে।"

১৮৫৮ সালে 'বেঙ্গল সোসেল সায়ে এসোসিয়েশনের' সভায় আবদুল লতিফ সাহেব পাঠ করেন একটা প্রবন্ধ, নাম—'মুসলমানদের শিক্ষা'। সার্বিক আলোচনার মধ্যে ছিল কলকাতা মাদ্রাসার করুণ চিত্রটিও। তা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিন সদস্য বিশিষ্ট একটা অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়। আবদুল লতিফ তারমধ্যে একজন। বাকি দু'জন ইংরেজ। অন্যদিকে লতিফ সাহেবকে মোকাবেলা করতে হয় বৃটিশ শাসন বিরোধী গোঁড়া আলেম সমাজকে। তারা ঘোষণা করেছেন, 'ভারত দারুল হরব এবং ইংরেজী পড়া হারাম'। এ মতবাদ খণ্ডনে আবদুল লতিফ স্মরণাপন্ন হন জৈনপুরের বিখ্যাত মাওলানা কেরামত আলী (রঃ)'র। তিনি ভারত, মক্কা ও মদীনার প্রখ্যাত আলেমদের মতামত নিয়ে ফতোয়া দিলেন, 'ভারত দারুল হরব নয় এবং ইংরেজী পড়াও হারাম নয়'। তাতে তার আধুনিক শিক্ষার অভিযান আরো জোরদার হয়।

মুষ্টিমেয় মুসলমান পদস্থ কর্মকর্তার মধ্যে আবদুল লতিফ ছিলেন এমন একজন যার মধ্যে ছিল মৌলিকত্ব, উদার দৃষ্টিভঙ্গি, অসীম কর্মদক্ষতা, সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সর্বোপরি 'রায়' দানের বিচক্ষণতা। এতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সকলের আস্থাভাজন হন, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়ে। আরবী ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আবদুল লতিফের সমাজ সচেতনতা, স্বাতন্ত্রতবোধ, সংস্কার সাধনা, প্রগতিপন্থী, নীতি বিধি প্রণয়ন, প্রবর্তন তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত করেছে। এক্ষেত্রে তিনি যুগনকীব। মুসলিম সমাজ শিক্ষায় ছিল পশ্চাদপদ। এর কুফল তিনি দিব্যি চোখে দেখেছেন, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন এবং উত্তরণের পথ আবিষ্কারে উদ্বিগ্ন হয়েছেন সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের মূল্য অনেক বেশী।

দৈনিক ইনকিলাব

4-D

তারিখ 06 JUL 1986
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

নওয়াব আবদুল লতিফঃ আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরিত হয়। অতি অল্প সময়ে সমিতির সদস্য সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৬০০তে এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে সমিতির শাখা স্থাপিত হয় বা অনুরূপ সংস্কারমূলক সমিতির সৃষ্টি হয়। এসব সমিতির মধ্যে ঢাকায় ১৮৮২ সালে স্থাপিত 'ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সমিতি'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুসলিম সমাজের জাগৃতির জন্যে সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পূর্ণজাগরণ। এবং যার জন্য শিক্ষার প্রসার ছিল তাঁর লক্ষ্যসমূহের অন্যতম। তিনি জীবন সায়াহ্নে ১৮৮৫ সালে লিখেছেন, 'আজ বাইশ বছর যাবত সমিতি কাজ করে যাচ্ছে। ভারতে মুলমানদের উন্নতি বিধানে এ সমিতি যথেষ্ট উদ্দীপনায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। যেদিকে একাজ চলেছে, সেদিকেই মুসলমানদের চিন্তায় ও অনুভূতিতে নতুন প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে। পুনঃ পুনঃ শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিকট মুসলমান সমাজের শিক্ষা, আইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা পেশ করতে কখনই বিরত হইনি, যার সংগে সমিতির মঙ্গলের যোগসূত্র রয়েছে'।

সমিতির উদ্দেশ্য সম্বলিত একখানা প্রচার-পত্র পেয়ে তৎকালীন ভারতের গাজীপুরের প্রধান সদর আমিন (পরবর্তী কালে স্যার) সৈয়দ আহমদ খান ব্যক্তিগত পরিচিতির জন্যে চলে আসেন কলকাতা। মেহমান হন লতিফ সাহেবের। উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়। সমিতির ষষ্ঠ মাসিক সভায় সৈয়দ আহমদ খান একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন—নাম, 'দেশপ্রেম ও ভারতে জ্ঞান প্রসারের প্রয়োজীয়তা।' সৈয়দ আহমদ প্রধানতঃ নওয়াব আবদুল লতিফের পেররণাতেই উত্তরকালে আলীগড় আন্দোলনের ব্যাপারে উৎসাহিত হন। মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনগুলো বিভিন্ন কারণে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণে তা ছিল অত্যন্ত সহায়ক। প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলার গভর্ণর। প্রায় দু'হাজার লেখক, চিন্তাবিদ ও শিক্ষিত ব্যক্তির এ সমাবেশে উপস্থিত থাকেন। খবরের কাগজে মন্তব্য হয়েছিল,—'এই আলোচনাসভা এমন বিরাট আকারের হয় যে শিক্ষা বিষয়ক এমন সভা ভারতে এই প্রথম'।

মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি অভূতপূর্ব কল্যাণকারী কর্মসূচীর ফল শুধু বাংলার মুসলমান সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়, সারা ভারতের মুসলমানের জন্যও তা ছিল এক নিয়ামত স্বরুপ। সমিতি শিক্ষা, সংস্কার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছে, সরকার ও জনগণের সাহসে যে আদর্শ উপস্থাপন করেছে তা মুসলমানদের শিক্ষার পথ যথেষ্ট সুগম করে। ভাইসরয় থেকে স্থানীয় গভর্ণর ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী ও সমিতির মতামতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। বৃটিশ-হিন্দু উপলব্ধি করে, উত্তরণের পথ সম্পর্কে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন আবদুল লতিফ। আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় জীবনে পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না। তাই তিনি প্রথম ১৮৫৩ সালে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটা রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রচার বিষয়—'ভারতীয় মুসলমান যুবকদের ইংরেজী শিক্ষার উপকারিতা এবং তা শিক্ষা দানের অনাপত্তিকর সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।' আর নিজের বিশ্বাস ছিল, 'যদি ভারতে কোন ভাষা শিক্ষার্থীকে জিবনে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে হয় তা হচ্ছে ইংরেজী। একইভাবে মুসমলমানদের ইংরেজী শিক্ষার রাজনৈতিক ফলাফল, নিজেদের এবং সরকারের উভয়ের জন্য বহুবিধ ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।'

১৭৮০ সালে স্থাপিত কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন ও উন্নতিবিধানে তৎপর হন আবদুল লতিফ। এ মাদ্রাসার অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র তৎকালীন মাদ্রাসার শিক্ষা মান সম্পর্কে মূল্যায়ন কমিটি বলেছেন, 'ছাত্রা কোন কাজের উপযুক্ত না হয়েই নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যেত'। চৌদ্দ বছর সম্পাদক থাকাকালে মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির কোন সভা ডাকতে দেননি। সংস্কার, পরিবর্তন তারা চায়নি। বরং চেয়েছিল শিক্ষা সংকোচন ও স্থিতিশীলতা। বহু চেষ্টার পর তারও কিছুটা সুরাহা হয়।

অর্থের অভাবে মুসলমান ছাত্ররা লেখা-পড়ায় অগ্রসর হতে পারে না আবদুল লতিফ অর্থের সন্ধানে তৎপর হলেন। এখান ওখান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। তার নজর পড়ে হাজী মোহাম্মদ মহসীনের উইলের দিকে। দেখা গেল, মুসলমানদের শিক্ষার জন্য প্রদত্ত টাকায় হুগলী মাদ্রাসা ছাড়া চলছে ইংরেজী শিক্ষার জন্য হুগলী কলেজ, ব্রাঞ্চস্কুল (হাইস্কুল) আর একটি পাঠশালা। সেখানে পড়ছে হিন্দুরা। মুসলমান ছাত্র সংখ্যা শতকরা দু'জন। মাদ্রাসা সম্পর্কে বাংলার গভর্ণর স্যার জে·পি· গ্রান্টের নিকট

দৈনিক ইনকিলাব

2-C

তারিখ ...06 JUL 1986...
পৃষ্ঠা... ... ...৬ কলাম...1...

একটা স্মারকলিপি পেশ করেন আবদুল লতিফ। গভর্ণর কোন সাড়া দিলেন না, অনন্যপায় হয়ে আবদুল লতিফ সরাসরি দেখা করেন বড় লর্ড মেয়োর-এর সাথে। অবস্থা বিশ্লেষণ করে তিনি মুসলিম শিক্ষার দুরবস্থার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বড়লাটের প্রশ্নের জবাবে প্রাদেশিকগভর্ণর জানান সরকারী স্কুল গুলোতে সাধারণ শিক্ষকের পদে কদাচিৎ (যদি কোথাও থেকে থাকেন) একজন মুসলমান দেখা যায়। বেঙ্গল এডুকেশনাল ডিপার্টমেন্টকে বলা যেতে পারে—একটা হিন্দু প্রতিষ্ঠান। উচ্চতম পদ ও শাসন সংক্রান্ত পদের নিম্নবর্তী সমস্ত পদেই হিন্দুদের একচেটিয়া অধিকার। এ পরিস্থিতিসন্দেহে মুসলমানদের যথার্থই প্রতিকূল অবস্থায় ফেলেছে। এর ফলে তাদের সংস্কার' ও অনুভূতি আহত হওয়ার অবশ্যই যুক্তি সংগত কারণ আছে।

অবশেষে আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় সুফল দেখা দিল। শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুল কলেজে মুসলমান শিক্ষক নিয়োগসহ অনেক সুবিধা দেয়া হয়। তাছাড়া উদ্ধারকৃত মহসীন ফাণ্ডের টাকায় (১) কলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার উন্নয়ন ব্যতীত (২) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে ছাত্রাবাসসহ তিনটি মাদ্রাসা স্থাপন করা হয় (৪) মহসীন ফাণ্ড থেকে মেধাবী মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৮২ সালে সরকার মিঃ ডবলু, ডবলু হান্টারের নেতৃত্বে এক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। লতিফ সাহেব মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির পক্ষ থেকে মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে এক স্মারকলিপি পাঠান। লিখেন (১) মুসলমান এখন আর ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধভাবাপন্ন নয়, (২) শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো মুসলমানদের প্রয়োজন মাফিক নয়, (৩) মুলমানদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত, (৪) মাতৃভাষা শিক্ষার উপর গরুত্ব আরোপ করা সমীচিন। মুসলমান সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও কমিশনের কাছে দাবী-দাওয়া পেশ করে। ফলে শিক্ষ কমিশন মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সতেরটি বিশেষ সুপারিশ করেন।

১৮৮৮ সালে 'দি ইংলিসম্যান' পত্রিকায় আবদুল লতিফের একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—নাম, 'মোহামেডান এডুকেশন'। মূল বক্তব্য ছিল—(১) পাঠ্যসূচী ছাত্রদের ক্ষমতার বাইরে। (২) মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা অপরিহার্য, (৩) ধর্ম নিরপেক্ষ নীতিপুস্তক সর্বশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য আপত্তিকর, (৪) তরুণ ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা সংস্থাগুলো যোগ্য নেতৃত্বাধীনে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা।

ধর্মশিক্ষার অপরিহার্যতার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমি বলতে চাই তরুণ ও যুবকদের নীতি শিক্ষা দিতে হলে যে ধর্মে তারা জন্মাবধি প্রতিপালিত, যা তাদের পিতা-মাতা অনুসরণ করতে ইচ্ছা করে— তাদেরকে সে ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে'।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোও টেকস্ট বুক কমিটির সদস্য হিসেবে আবদুল লতিফ যে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা অতি বিস্ময়কর। ১৮৭৩ সালে এফ.এ.বিএ. এবং এম.এ শ্রেণীর পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন কমিটিতে তিনি এই মর্মে সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। (১) ভারতীয় যুবকদের ইংরেজী শিক্ষক হওয়া উচিত তা হবে ব্যবহারিক বা ফ্যাংসনাল। (২) ইসলাম ও রসুলুল্লার উপর আক্রমণাত্মক পুস্তকাবলী পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। (৩) জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের প্রতি বিদ্রুপাত্মক পাঠ্য পুস্তক বাদ দিতে হবে। (৪) বাংলা ভাষায় রচিত পাঠ্য পুস্তকে দূরহ সাংস্কৃতবহুল বাংলা ব্যবহার না করে মুসলমান জন-সমাজে ব্যবহৃত শব্দাবলী ব্যবহার্য অব্যাহত রেখে মুসলমান ছাত্রদের জন্য আলাদা পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মনীষী আবদুল লতিফের এসব বাণীর ফলেই উত্তরকালে মক্তবের জন্য আলাদা পাঠ্য-পুস্তকের ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে মুসলমানদের সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ইংগিত আছে। বাংলা ভাষা বাংগালী মুসলমানের জবানে যে ভাষায় তাদের ধর্ম, জাতীয় আদর্শ, ইতিহাস, জীবনী আলেখ্য প্রতিফলিত না হওয়া পর্যন্ত চেতনাবোধ তরান্বিত হবে না—এ তিনি দূরদৃষ্টিতে সম্যক অনুধাবন করেন।

মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বলতে গেলে এককভাবে আবদুল লতিফ যা করেছেন তার তুলনা মেলা ভার। তার শিক্ষানুরাগিতা, উদার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগি, বলিষ্ঠ মতবাদ প্রকাশের সৎসাহসিকতার ফলে সরকার তাকে বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য হিসাবে কাজ করার সুযোগ দেন। ১৮৬০ সালে পরীক্ষা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করেন। পরে কেন্দ্রীয় পরিষদ কমিটির সদস্য হন। ১৮৬৩ সালে তিনি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। ১৮৮২ সালে তাকে নিয়োগ করা হয় টেকস্ট বুক কমিটিরর সদস্য এবং সিভিল ও মিলিটারী পরীক্ষরা সদস্য। একজন শিক্ষা সংস্কারক হিসেবে আবদুল লতিফ ছাত্রদের আজো সত্যদর্শন হিসেবে দিগদর্শনের কাজ করছে।

দেশপ্রেমের এক দুর্জয় চরিত্রের স্থান মেলে তাঁর মধ্যে। ১৮৫৩ সালে পঁচিশ বয়সী যুবক সাতক্ষীরা (কলারোয়া)র মহকুমা হাকিম এস,ডি,ও। মাত্র এক বছরের চাকরি জীবন এখানে এবং অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ ও দেশময় আলোড়নকারী। নীলকুঠিয়াল ও তাদের সহযোগী হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের নির্মম শিকার দারিদ্র পীড়িত মুসলমান প্রজাবৃন্দ। হিন্দু জমিদারদের মধ্যে ছিলেন প্রিন্স দারকাণাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ। প্রকাশ্যে ও গোপন তদন্তাবস্থায়, সত্যতা ও তীব্রতায় বিচলিত প্রতিবাদের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। অকুতোভয়ী এসডিও সমস্ত অবস্থা বিশ্লেষণ করে এক স্মারকলিপি সরকারের নিকট পেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে 'নীল কমিশন'-এর উদ্যেশ্যে চাষী, অফিসার সর্বস্তরের মানুষের সাক্ষ্যে অত্যাচারের নির্মম কাহিনী ফুটে ওঠে। ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টাওয়ার বলেছেন, 'আমার মনে হয় রক্তরঞ্জিত না হয়ে এক টুকরো নীলও ইংল্যাণ্ডে রফতানী হয়নি।' তারই প্রতিচ্ছবি দেখা যায় নীল দর্পনে (১৮৬০)।

১৮৯৩ সালের ১৭ জুলাই ঢাকা গেজেটে বলেছে, 'নওয়াব আবদুল লতিফ বাহাদুরের মহৎ চেষ্টায় নীল কুঠিয়ালদের যে অঞ্চলের গরীব প্রজাদের অত্যাচারের কাহিনী জন গোচরে আনীত হয়। এটা কম সাহসের কথা নয়। নীলকুঠিয়ালদের অত্যাচার কঠোরভাবে দমনে তিনি (আবদুল লতিফ) দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেন। সরকারী কাজে নিয়োজিত থাকা সত্বেও মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক বিভিন্ন কাজে বারবার তাঁর ডাক পড়েছে। ১৮৬২ সালে প্রথম বংগীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ১৮৭০ ও১৮৭২ সালে সদস্যপদ অলংকৃত করেন। তাছাড়া কলকাতা কেন্দ্রিক অনেক স্থানীয় কমিটি মিউনিসিপ্যালিটি ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করেন। তারই জন্য তার নামে রোড লেইনের নামকরণ হয়। সমাজসেবামূলক কাজে ঐতিহাসিক অবদান রাখার জন্যে তাকে ১৮৭৭ সালে খান 'বাহাদুর' ১৮৮০ সালে 'নওয়াব' ১৮৮৩ সালে 'সি,আই,ই,' উপাধি প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি গরীব কৃষক সমাজের এবং অধঃপতিত মুসলমানদের হৃদয়ে সথায়ী আসন লাভ করেন, তাই ছিল তাঁর জীবনের সবচাইতে বড় পুরস্কার।

নওয়াব আবদুল লতিফ আজ আর নেই। তবে বাংলাদেশ তথা বাঙালী মুসলমানের শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তিনি যে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন তা সত্যই অতুলনীয়। উনিশ শতকের সেই ঘোর দুর্দিনে বাংলা তথা সারা ভারতের মুসলমানরা যখন সবদিক দিয়ে পর্যুদস্ত ও দিশেহারা জীবন যাপন করছিল তখন নওয়াব আবদুল লতিফের বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে নবজাগরণের পথে অগ্রসর হয়। স্যার সৈয়দ আহম্মদকে সাধারণতঃ মুসলিম ভারতের আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ বলে মনে করা হয়। অথচ প্রকৃত সত্য এই যে, বাংলার এই অমর মনীষী সংস্কারের ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দেরও পূর্বসুরী ও পথপ্রদর্শক